International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 38-42
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 26-02-2026
Accepted: 09-03-2026
Publish : 10-03-2026

Bulbuli Oraon
M.A in Bengali,
Cooch Behar Panchanan-Barma University,
West Bengal, India

Correspondence:
Bulbuli Oraon
M.A in Bengali,
Cooch Behar Panchanan-Barma University,
West Bengal, India

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্তের সংগ্রাম, জীবনের ক্লেদ, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও স্বপ্ন ভাঙার আর্তনাদ

Bulbuli Oraon

Abstract:
১৯০৩ - ১৯৮৮ এই সুদীর্ঘ জীবনে, প্রায় ৬৪ বছর ধরে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর সার্থক রচনার জন্য নানা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। সুসংবদ্ধ গল্পের যে অবয়ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তার মধ্যেই তিনি দেখিয়েছিলেন - জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় রূপের উদ্ভাস। আর্থ সামাজিক বা নৈতিক সংকট, ব্যক্তি মানুষের বিশেষত নারীর যন্ত্রণা, পরিবারের গৃহবধূ থেকে পতিতা নারী - সবই তাঁর সৃষ্টির দর্পণে ধরা পড়েছে সার্থকভাবে। তীব্র বিদ্যুৎএর আলোতে যেমন আকাশ অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়, তেমনই তাঁর গল্পের চরিত্র বা কাহিনীর আভাসে জীবনের বহু বিচিত্র দিক ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পগুলিতে। এই গবেষণা ধর্মী লেখাতে মূলত প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠা জীবন যন্ত্রণা, সামাজিক ও মানসিক টানাপোড়েন এবং বাস্তবতার মধ্যে গড়ে উঠা নির্মম অভিজ্ঞতার আলোকে, স্বপ্নভঙ্গের রূপটিই তুলে ধরা হয়েছে।

Keywords: মধ্যবিত্ত, জীবন সংগ্রাম, নগর জীবন, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, স্বপ্নভঙ্গ, কল্লোল যুগ।

ভূমিকা: বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই দ্বিতীয় শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। যিনি ছোটগল্পে এবং কবিতায় সর্বাকারে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের যে পর্বটিকে 'কল্লোল যুগ' বলা হয়ে থাকে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সেই পর্বের অন্যতম প্রতিনিধি। কল্লোলীয় জীবন-দর্শনের একটা ভাবরূপ এদের মধ্যে আভাসিত হয়ে ওঠে। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবদান ছিল, তিনি তাঁর গল্পগুলিতে বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। কল্লোল যুগের অন্যতম কান্ডারী হলেও তিনি কল্লোলীয় যুগের লেখার ধরণ রোমান্টিক কল্পনাকে সরিয়ে স্থান দিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে কেবল নগর জীবনের যন্ত্রণাই তিনি ফুটিয়ে তোলেননি, অস্তিত্বের লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত, মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা এবং স্বপ্নভঙ্গের হাহাকারের ছবিও এঁকেছেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের অন্যতম গল্পকার ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন, সেই পরিবেশের মধ্যে মনটা যেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেটাকেই তিনি বলেছেন মনের সঠিক পরিচয়। এই রকম পরিবেশ সৃষ্টিতেই ছিল তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন— "মানুষের জীবন তার সাময়িক প্রাকৃতিক সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে জড়ানো। স্খলনে-পতনে, আশা-নৈরাশ্যে, গ্লানি মহিমায়। সার্থকতায় ব্যর্থতায় যেমন তা নিজের যুগে নিজের দেশে দেখেছি তা যতখানি সাধ্য আমার গল্পগুলিতে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি।" তাঁর গল্পগুলিতে যুগচেতনার উদ্ভাস যেমন পাই, তেমনি গল্পগুলি ও শিল্পগুণে উজ্জ্বল। তাঁর গল্পের প্রকরণ রীতি বিশিষ্ট মনোযোগের দাবি রাখে। জীবন দৃষ্টির প্রতিফলন কিভাবে ঘটিয়েছেন এবং কেমন ভাবে বিভিন্ন গল্পের শিল্পরূপ তিনি দিয়েছিলেন তা আলোচনার আগে ব্যক্তিজীবনের আলোয় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আমরা দেখে নিতে পারি। যুগের নিরিখে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা তার জীবনচর্যা একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলে। এই অভিজ্ঞতার জগৎটি সকলের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। শিল্পী সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক যখন প্রকাশ পায় তাঁদের নিজের নিজের সৃষ্টিতে, প্রত্যেকের জীবনদৃষ্টি আর জীবন ভাবনার প্রতিফলন দেখি তাতে। শৈশবে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাও, কখনো সরাসরি বা কখনো স্মৃতিবাহিত হয়ে তাঁদের রচনায় ছাপ রেখে যায়। ছোটগল্পের মাধ্যমে ও জীবনের বিচিত্র তীব্রতম অনুভূতি গুলিও লেখক এঁকে যান তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে। আর তার পথ ধরে পাঠক সমাজে বসবাসকারী মানুষের জটিল গভীর অনেক সমস্যার শিকড়ে পৌঁছে যেতে পারেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাবা ছিলেন রেলের অ্যাকাউন্টেন্ট এবং হুগলি জেলার বিখ্যাত মিত্র পরিবারের সন্তান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র। কোন্নগরে তাদের আদিবাসস্থান ছিল। আর মা ছিলেন রাধারমণ ঘোষের কন্যা সুহাসিনী দেবী। রাধারমণ ছিলেন রেল কোম্পানির চিকিৎসক। লেখকের ছোটবেলায়, তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। তখন তাঁর মাতামহ

মেয়ে সুহাসিনী ও প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি পরিচয়ের বাইরেও আরও যে সব পরিচয় ছিল, গল্পকার পরিচয় ছিল তার মধ্যে অন্যতম। "আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের - আমি কবি যত ইতরের।" - এমন ঘোষণাতেই লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে চিনে নেওয়া যায়। 'কল্লোল' এর লেখক বলে যারা পরিচিত ছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। তাই প্রেমেন্দ্রর গল্পে আমরা খুঁজে পাই সেই ধারাটিকেই যেখানে জীবনের স্রোত, ও ভাগ্য ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে মুমূর্ষু মানুষ জীবনের প্রতি লড়াই করে ফেরে।

ক্লেদাক্ত দিক দেখিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র, কিন্তু জীবন যে শুধুই ক্লেদাক্ত তা তিনি বলেননি। তাঁর চরিত্রগুলি ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল জীবন থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন নাগরিক চেতনা ও মধ্যবিত্ত দৈন্যন্দিন জীবনের রূপকার। লেখক অবশ্য নিজে চেয়েছিলেন -"যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙ্গা ফ্যাকাশে জীবনের গল্প লিখতে"। মধ্যবিত্ত জীবনের বা দাম্পত্য জীবনের বৈধ রূপের পাশে প্রেমেন্দ্র মিত্র এঁকেছিলেন পতিতা ও ব্রাত্য জীবনকে। "মানুষের চেয়ে নহে কিছু বড়, নহে কিছু মহীয়ান"— এই ভাবাদর্শে ভাবিত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তেমনি সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গ বলেন "তাঁর গল্প গঠনকৌশল তাঁর কবিতার মতোই সংযত, ঘন পিনদ্ধ এবং তির্যক। ভাষা নির্বাচনেও তাঁর ঈর্ষাযোগ্য সতর্কতা।"

"শুধু কেরানী" প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরানী'তে সাধারণ এক কেরানী দম্পতির সাধাসিধে প্রেমময় জীবন চিত্র এঁকেছেন। মধ্যবিত্ত কেরানী দম্পতির আর্থসামাজিক সমস্যাকে সামনে রেখে লেখক গল্পটির আবেদন আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা আর্থিক দৈন্যতা তাদের সংসারে বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল। এই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা এই অতি সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরানীদের নেই। তারা এই বিপর্যয়কে ভাগ্য বলে মেনে নিতে বাধ্য— "তারা সৃষ্টির বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে এই অকারণ উৎপীড়নের জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠতে জানে না। নির্দোষের উপর এই অন্যায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষপাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে। মানুষের কাছে তারা মাথা নীচু করে চলে, বিধাতার কাছেও।" 'শুধু কেরানী' থেকে আমরা নগর জীবনের যে প্রেক্ষাপটটি পাই, কিন্তু গল্পের নায়ক-নায়িকা নগর জীবনে থেকেও যথেষ্ট সহজ সরল ছিল। ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেনা, স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ জোগানো। ট্রামের তার খারাপ হওয়ায় ছেলেটির অফিস থেকে ফিরতে দেরী হওয়া। এই সব টুকরো ছবিতে নগর জীবনের যে রূপ ধরা পড়ে, তাতে কেরানী জীবনের অসহায়তা আরও তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছে।

যুগের নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকা। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ও তার করুণ পরিণাম। গ্লানিময় পঙ্কিল জীবনে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে, যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, তা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে চিত্রিত হয়েছে। যে ছেলেটি নতুন সংসারে অফিস থেকে ফেরার পথে ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে স্ত্রীর জন্য ফুলের মালা আনত, সে এখন হেঁটে আসে ট্রামের পয়সা বাঁচায় স্ত্রীর অসুখের খরচ জোগাতে। চঞ্চল পাখিদের খড়কুটো দিয়ে নীড় বাঁধার পাশাপাশি নবীন দম্পতির সংসার জীবনের সূচনা হয়েছিল। গল্পে সেই নবীন দম্পতির সংসার ভাঙনের ছবি প্রতিষ্ঠা পায়— "কালবৈশাখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড় ভাঙার মহোৎসব সঙ্গে।" আমাদের এই অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোতে যে সব সাধারণ মানুষ গুলির জীবন ধূসর হয়ে পড়ে, জীবন যুদ্ধে যারা হেরে যেতে বাধ্য হয়— 'শুধু কেরানী', গল্পটির কেরানী ছেলেটি তাদেরই প্রতিনিধি ছিল। লেখকের সংযমবোধ ও সহানুভূতিপূর্ণ জীবনদৃষ্টি গল্পটিকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

গল্পটির স্পষ্টই দুটি বিভাগ। প্রথম ভাগে দম্পতির নতুন সংসার গড়ে ওঠার ছবি, দ্বিতীয় ভাগে 'ফুরিয়ে যাওয়ার' ছবি লেখক এঁকেছেন। প্রতীক, বাক সংযোগ আর স্বয়ং সম্পূর্ণতার এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন লেখক। দুই তরুণ-তরুণী বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে ঘর বেঁধেছিল। কেরানীর চাকরি করা আয়ে তাদের সুখের অভাব ঘটেনি। পায়ে হেঁটে, ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ছেলেটি যে ফুলের মালা আনত, তাতে এক রঙিন জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। দুজনের সংসারে আসে খোকা। তারা মনে করেছিল এভাবেই কেটে যাবে জীবন, গানের পাখনা মেলে। কিন্তু তা সত্য হয়নি। মেয়েটি সূতিকা রোগাক্রান্ত হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শীর্ণ হয়ে যায়। যুবকটির পক্ষে ভালো চিকিৎসা করানো সম্ভবপর হয় না। মুমূর্ষু জিজ্ঞাসাকরে হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না? আর স্বামী মিথ্যা আশায় বুক বেঁধে ভরসা দেয়— "বাঁচবে না কেন, কী হয়েছে তোমার?"

যাদের নেই, যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূণ্য জীবনের গল্প লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তারা বাংলার একটা কেরানী আর কেরানীর কিশোরী বধূ। সামান্য পয়সায় সংসার চালাতে হয়। ফুলের মালা কেনবার জন্য ছেলেটিকে ট্রামের পয়সা বাঁচাতে হয়। বউয়ের অসুখ হলেও রাঁধুনি রাখা যায় না। অথচ তারা দেশ-বিদেশের খবর রাখে না, তাদের পরস্পরের প্রতি তীব্র ভালোবাসায়, নির্ভরতায় তারা তাদের জীবন দীপটি জ্বালিয়ে রাখতে চায়। তবুও জীবন যুদ্ধে তাদের শেষ রক্ষা হয় না। গরিব কেরানী বধূটির জীবনদীপ আস্তে আস্তে নিভে যেতে থাকে। গল্পের শেষে মৃত্যু পথযাত্রী কেরানী বধূটি যখন বলে— "আমি মরতে চাইনি ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি।" তখন তার বাঁচতে চাওয়ার প্রবল তৃষ্ণা ও বাঁচতে না পারার তীব্র যন্ত্রণা পাঠককেও আচ্ছন্ন করেছে। এখানে মৃত্যুকে ছাপিয়ে জীবন তৃষ্ণার স্বাক্ষর আঁকা হয়ে যায়।

মহানগর:

মহানগর গল্পে যেখানে পরিবেশ পরিস্থিতি একজন নারীকে বাধ্য করেছিল পতিতা হতে। এই গল্পে রয়েছে দুই ভাই বোন। ভাই রতনকে দিদি চপলা বড়ো করেছে, পরম স্নেহে। মা মরা রতন তার দিদিকে ছাড়া বুঝতো না। দিদির আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই জানা ছিল না রতনের। তাই ফিরে ফিরে সেই আশ্রয় খুঁজে রতন। নতুন আত্মীয়তার অর্থ, শর্ত না বুঝে, রতন বার বার উপস্থিত হয় দিদির শ্বশুড়বাড়িতে। আর তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর হঠাৎ একদিন রতনের দিদিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রতন ও তার পরিবার, পরিজন সকলেই খোঁজ করে ফেরে দিদির। তারপর রতন একদিন শোনে অনেক দূর থেকে পাওয়া গেছে দিদিকে, পুলিশ উদ্ধার করেছে। এর পরেই যেন ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা দিদিকে যখন পুলিশ উদ্ধার করেছিল, তখনই যেন দিদি সত্যি সত্যি হারিয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে দিদিকে কেউ খোঁজে না, ফিরিয়ে আনে না। বড়দের স্বরচাপা আলোচনায় একটা রহস্য ধরা পড়ে, রতন সেই রহস্য বোঝে না। সে কেবল দিদির জন্য আকুল হয়। সে জানে মহানগরই তার দিদির আশ্রয়।

সেই মহানগরের উদ্দেশ্য রতন বেরিয়ে পড়ে, তার দিদির খোঁজে। পোনার নৌকায় চড়ে রতন বেরিয়ে পড়েছিল দিদির খোঁজে, কেন না সে জেনে নিয়েছিল তাঁর দিদি উল্টোডিঙ্গিতেই থাকে। বাবার চোখে ফাঁকি দিয়ে, একদিন সে বেরিয়ে পড়েছিল দিদির খোঁজে। লেখক মন্তব্য করেছেন -"যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে

খুঁজে বার করবে"। এই অসাধ্য সাধন করার জন্য রতনের কোনো ভয় বা ক্লান্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে দিদিকে খুঁজে পেয়েছিল। ভাইকে দেখে চপলা চোখের জল ফেলেছিল। দিদির সাজানো-গোছানো ঘর দেখে রতন অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অবাক হলে চলবে না। দিদিকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু দিদি বলে যে আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই। এই কথা শুনার পর রতন ভয় পেলেও সে সিদ্ধান্ত নেয় আজীবন দিদির কাছেই সে থাকবে। কিন্তু দিদিকে নিয়ে যাওয়ার আশা তার পূরণ হয় না।

দিদি তাকে চারটে টাকা দিয়ে চলে যেতে বলে। দিদির প্রতি অভিমানে রতনের বুক ভেঙে যায়। মহানগরের কোন কলুষতা তার দিদির জীবনকে নষ্ট করেছে, সে তা জানে না। তাই ফিরে যেতে যেতে সে আবার ঘুরে আসে। বলে— "বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি, কারুর কথা শুনব না।"

বুক ভেঙেছে চপলারও। তার ছোট ভাই রতন, তাকে খুঁজতে খুঁজতে এতদূর আসবে ভাবতে পারেনি। চপলা জানত সমাজ-সংসারে সে ব্রাত্য! ছোট ভাইটির বুকে তার জন্য এখনো যে ভালোবাসা, মায়া রয়েছে তা দেখে চপলা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। রতন যখন অনেক খোঁজার পর উল্টোডিঙ্গিতে পৌঁছে ছিল— "চপলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়।" রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তাঁর কষ্ট হয়। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে। দুজনেই খানিকক্ষণ থাকে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা গলায় বলে, "তুই একা এসেছিস!" নাগরিক নিয়মের মায়াবী আলোয় যেমন ঢাকা পড়তে থাকে বহু অথহীন কদর্যতা— তেমনি চপলার গ্লানিময় জীবনেও রতনের সারল্য চাপা পড়তে থাকে।

ছোট ভাইটির হঠাৎ এই বড়ো হয়ে যাওয়া কি বুঝতে পারে চপলা? না সে বুঝতে পারে না, স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক দেখা হয়েছে তার জীবনে। জীবনের দীর্ঘতা তার বেশি দিনের নয়— তবুও সে বুঝেছিল তার কোনো জোর নেই। সামাজিক নিয়মে স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিল চপলা। স্থায়ী হয়নি তার সেই ঘরের স্বপ্ন। অপরাধ নিজের না হলেও, অন্যর অপরাধ সামাজিক কলঙ্ক গায়ে লাগায়, অপরাধী হতে হয়েছে তাকেই। স্বামী বা পিতা কারওই আশ্রয় না পাওয়ায়, তাঁর স্থায়ী জায়গা হয়েছিল উল্টোডিঙ্গির বেশ্যা পাড়ায়। সেই আশ্রয় সে পেয়েছিল তার শরীরের বিনিময়ে। অন্যের আশ্রয় সে হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের বাস্তব অবস্থান থেকে যে জীবনকে আমরা দেখতে পাই না, সেই জীবনকেই রতনের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে। দেখানোর বা বোঝানোর যে চেষ্টা করা হয়েছে, আমাদের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। রতনের চোখ দিয়েই আমাদের পাঠক তার দিদিকে দেখে। শুধু রতনের দিদি নয়, এই রকম অনেক বালকের দিদিই তাদের স্বাভাবিক জীবন থেকে হারিয়ে যায়। সমাজের অবিচারে, আর মানব জীবনের সহজ সম্পর্কগুলি নষ্ট হয়ে যায়। স্বচ্ছ জলের ওপর যেমন কালো মেঘের ছায়া পড়ে, তেমনি প্রতিফলিত হয় গাঢ় অন্ধকার জীবন। জীবনে গাঢ় কৃষ্ণরূপ।

সমাজের নিষ্ঠুর চোখ রাঙানিকে সাধারণ মানুষজন ভয় করে চলে বলেই, এই হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য স্নেহময়ী নারীদের, আরও তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারে না। এই বালকটি যেন দুঃসাহসের কথা উচ্চারণ করেছে। সে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার দিদির মতোই আরও অনেক দিদিকে সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনবে। বালক রতনেরও বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশি সময় লাগে না হঠাৎ তার ভাবনায় একটা পরিবর্তন এসেছে। রতন বুঝেছিল এই অন্যায়, কলঙ্কটা তার দিদির নয়, অন্য কোথাও থেকে তার দিদিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তার স্বাভাবিক জীবন থেকে তাকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করা হয়।

এই গল্পে সমাজের একটা গুরুতর সমস্যাকে সার্থকভাবে লেখক বালকের নিষ্পাপ দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছিলেন। জীবনরস এক শিল্পিত মূর্তি লাভ করেছে। আমাদের সমাজের এই অন্ধকারময় জীবনের যে সমস্যা, যা রোধ করতে বা সমাধান করতে, প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এগিয়ে আসে না, এই রকম ভয়ঙ্কর সমস্যার শিশুর মনে প্রতিফলিত হয়েছে, সাড়া জাগিয়েছে। এই নির্মম ভয়ঙ্কর সত্যকে সে অনুভব করতে পারে। তার এই অনুভব অকৃত্রিম ও মানবিক।

রতনের দিদি চপলা সামাজিক ব্যাধির শিকার, বিপর্যস্ত নৈতিক জীবনের শিকার হয়েছিল। দিদির সঙ্গে ভাইটির সম্পর্ক ভেঙে যায়নি, ভাই তার দিদিকে ভুলে নি; অথচ ভয়ঙ্কর এক অন্তরাল তৈরী হয়েছে দুজনের মধ্যে। অসুস্থ সমাজ দুই ভাই বোনের পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে যেন এক লৌহ যবনিকা সৃষ্টি করেছে। অন্যায় নিষ্ঠুরতাকেই বালক রতন ভাঙতে চায় বড়ো হয়ে। মধ্যবিত্ত জীবন বা দাম্পত্য জীবনের মধ্যে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র চিত্রিত করেছিলেন পতিতা ও ব্রাত্য জীবনকে। সমাজের শিক্ষিত, ভদ্র মানুষের কাছে, তাদের চোখে যারা পরিত্যাজ্য, ব্রাত্য, ঘৃণিত। "মানুষের চেয়ে নহে কিছু বড়ো, নহে কিছু মহীয়ান।" প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পগুলিতে পতিতরা যে কতটা অসহায় ও প্রতিনিয়ত বঞ্চনার শিকার তা দরদের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন।

সংসার সীমান্তে :

'সংসার সীমান্তে' গল্পটিতে এক পতিতা নারী রজনী ও তার ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবন এবং তার দাগী চোর অঘোর দাসের সঙ্গে গড়ে ওঠা প্রণয় কাহিনী ও তার পরিণামকে জীবন্ত করে তুলেছেন লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র নাগরিক প্রেক্ষাপটে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোয়, সামাজিক কাঠামোয় অবহেলিত মানুষের যে সমস্যা তার সঙ্গে গল্পটিতে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও মিশে গেছে। গল্পের নায়ক চোর অঘোর দাস ধরা পড়ার ভয়ে, বিপদ থেকে রক্ষা পেতে, আশ্রয় নিয়েছিল পতিতা রজনীর ঘরে। যে দুর্যোগ এর মধ্যে কুকুর, বেড়ালও বেরোয় না রাস্তার মধ্যে। এমনি এক দুর্যোগ রাত্রে পতিতা রজনী নিতান্ত অসহায় হয়েই, কিছু রোজগারের আশায় বৃষ্টিতে ভিজে বসেছিল বারান্দার এক কোণে। কিন্তু অঘোর দাসের আগমনে সে কিছুটা ভয় পেলেও কুপির আবছা আলোয় অঘোর দাসের মুখ দেখে তার মনে হয়েছিল - "মুখখানা চোয়াড়ে হইলেও কেমন যেন কুৎসিত নয়। চোখে ও ঠোঁটের কোণে সর্বদাই একটু হাসির ভাব লাগিয়া আছে নির্দোষ ব্যঙ্গের হাসি।"

কিন্তু প্রথম রাতেই, অঘোর এতটাই অকৃতজ্ঞ ছিল যে, ভোরের বেলা যাওয়ার সময় রজনীর খুঁট খুলে টাকা নিয়ে পালায়। দুটি নর নারীর প্রথম মিলনের ইতিহাস এই রকম ভাবেই কালিমালিপ্ত হয়। কিছুদিন পরে অঘোর ফিরে এলে, রজনী তাকে চোর অপবাদ দেয় সকলের সামনে। অঘোর সেই অঞ্চলের লোকজনের কাছে প্রচণ্ড বেদমহারে মার খায়। কিছুটা পুলিশের ভয়ে, কিছুটা করুণা বা সহানুভূতিতে রজনী তাকে কয়েকটা দিন সেবা করে, সুস্থ করে তোলে। তাদের দুইজনের মধ্যে গোপনে তৈরী হয় অনুরাগ। এই দৈন্যদশা থেকে তারা দুজনেই কিভাবে বেরবে তা ভাবে। রজনী অঘোরকে চুরি ছেড়ে দিতে বলে। অঘোরও চায় রজনী তার সঙ্গে থাকুক। কিন্তু রজনী দেনা শোধ না করে যেতে পারবে না। তার বাড়িওয়ালির কাছে দেনা, পাওনাদারের কাছে দেনা, তা না মিটিয়ে যেতে পারবে না। তাই রজনীকে ঋণ মুক্ত করার জন্য অঘোর শেষ বারের মতো চুরি করে। এইভাবে ও একে অপরের কাছাকাছি আসার ফলে, অনেকবার নিজেদের

মধ্যে বিবাদের পরেও, ঘৃণা ও বিরক্তি ভরা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দুটি সমাজ থেকে ত্যাগ করা মানুষের জীবনে আসে নতুন মাত্রা ভালোবাসা। কতরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ভালোবাসার জন্ম হয়ে থাকে। সেই ভালোবাসা মানুষের জীবনকে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নির্মাণ করে থাকে, কতরকম ভাবে জীবনের পথ নির্দিষ্ট করে দেয় - সব কিছুই ধরা পড়ে লেখকের অদ্ভুত জীবনাগ্রহে। অঘোর আর রজনী তাদের জীবনের কর্দমাক্ত ও পঙ্কিল জীবনকে পিছনে ফেলে, কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে তাদের যে গ্লানির স্মৃতি রয়েছে, তাকে পিছনে ফেলে, তারা সন্ধান করবে নতুন জীবনের - তাদেরও সাধ হয়ে থাকে নতুন আলোর পথে তারা যাত্রা করবে। প্রেমেন্দ্রের কলমে ব্যাঙ্গধ্বনিত হয় - "গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদ পঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীর জীবন লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়।"

এই ব্যাঙ্গ লেখক মূলত ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল জীবনে বেঁচে থাকা, দুটি নর-নারীর প্রতি করেননি ব্যাঙ্গ করেছেন সমাজের প্রতি। কারণ আমরা দেখেছি, মানুষ এই গ্লানিময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও, ক্ষয়িত সমাজ তাকে মুক্তি দেয় না। অঘোরের চুরি করা টাকায় তাদের নতুন সংসারের সব কেনা হলেও, কুড়িটা টাকা কম পড়ে রজনীর দেনা শোধের জন্য। রজনী অঘোরকে শেষ বারের জন্য চুরি করতে যেতে দিতে চায়নি, কিন্তু অঘোর তবুও গিয়েছিল চুরি করতে এবং ধরা পড়ে। আদালতের বিচারপতি অঘোরকে পাঁচ বছরের জন্য জেল দেন। তখন বহুবার জেল খাটা দাগী চোর অঘোর দাস পাগলের মতো আচরণ করে। রজনীর কাছাকাছি এসে অঘোর এই প্রথম জীবনে নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছিল, তার সেই স্বপ্নের জীবনকে সে আর কিছুতেই হারিয়ে যেতে দিতে চায় না।

এখানে অঘোর ও রজনী দুজনেই তাদের জীবন অতিবাহিত করেছে অসাধু বৃত্তিতে। আমাদের সমাজ সুস্থ ছিল না বলেই, আমাদের ব্যবস্থায় বৈষম্য ছিল। এই বন্টন ব্যবস্থায় বৈষম্যর জন্যই নিরক্ষর সাধারণ মানুষগুলি তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিনের খাবার জোগাড়ের জন্য এই অসাধু বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জীবনে নৈতিক শিক্ষা লাভ করে সুস্থ জীবনের, সুন্দর জীবনের পরিস্থিতি সমাজ এদের দেয়নি। কিন্তু এদের মধ্যেও খাঁটি মানুষের সত্তা লুকিয়ে থাকে। লেখক এখানে সমাজের অসুস্থতাকেই বিদ্রূপ করেছেন। লেখকের ঘৃণা এই সাধারণ বঞ্চিতদের প্রতি ছিল না, ঘৃণা ছিল সমাজের প্রতি। বারাঙ্গনাকেও যে বিয়ে করা যায় তাদের মধ্যেও যে নারীর কোমল প্রবৃত্তি, মায়া, মমতা রয়েছে, সেও যে বধূ হতে পারে, জায়া হতে পারে, একথা আমাদের ক্ষয়িত সমাজ স্বীকার করে না।

সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, পতিতাবৃত্তির পিছনে রয়েছে, সামাজিক অসুস্থতা এবং এর ফলেই জন্ম নেয় বিপন্নতা। সামাজিক অসুস্থতার কারণেই নারী তার স্বাভাবিক জীবন ছেড়ে পতিতা বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, ভাগ্যের কাছে হেরে যাওয়া মানুষ তাদের ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবন থেকে বেরোনোর জন্য অনেক সময় এই বৃত্তি গ্রহন করে। এদের স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের অধিকার রয়েছে। এরা যে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তার দায়িত্ব সমাজ অস্বীকার করতে পারে না। অঘোর ও রজনী যাদের বৃত্তি ছিল রাতের অন্ধকারের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজের অন্ধকার তাদের কালিমালিপ্ত জীবন থেকে তাদের মুক্তি দেয়নি। সমাজের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার এখানে এক হয়ে গেছে। বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি লেখক আঙুল তুলেছেন। সমাজের অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের জন্য সহানুভূতি তাঁর লেখায় ধ্বনিত হয়েছে— "পাপী পাপ করে না, পাপ করে মানুষ বা আরও স্পষ্ট করে বললে মানুষের ভগ্নাংশ। মানুষের মনুষ্যত্ব সব পাপের পাওনা অনায়াসে চুকিয়ে দেউলে হয় না।" তাই 'সংসার সীমান্তে' গল্পটি আঁধারের মধ্য শেষ হয় না, তাই আশার প্রদীপটি ঝড়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে অনন্তকাল ধরে রজনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে চলেছে, তার স্বপ্নের জীবন ও স্বপ্নের মানুষটির জন্য।

স্টোভ :

মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্র হল - শশিভূষণ, বাসন্তী, মল্লিকা। স্টোভটি ছিল তাদের তিনজনেরই প্রতীক। মল্লিকা ছিল শশিভূষণের প্রাক্তন প্রেমিকা। মল্লিকা তার কাজের জায়গা যাবার আগে এসেছিল শশিভূষণের বাড়িতে বেড়াতে। স্টোভটি কেন্দ্র করে কাহিনী এগিয়েছে। বাসন্তী বিয়ে হয়ে এই বাড়িতে আসার পর শুনেছে, তার স্বামী শশিভূষণের প্রাক্তন প্রেমিকার কথা। কিন্তু তার স্বামী শশিভূষণ তাকে মল্লিকার কথা কোনদিন বলেননি। বাসন্তী আর শশিভূষণের ভাঙা চোরা দাম্পত্যের প্রতীক ছিল খারাপ স্টোভ। শশিভূষণ একজন ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ ছিলেন, যে প্রেমিকা মল্লিকাকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও গ্রহণ করতে পারেননি। মল্লিকাকে শশিভূষণের বাড়িতে সবাই চিনত। মল্লিকাকে গ্রহণ না করে তার থেকে দূরে সরে গিয়ে সে দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিল। বাসন্তী বিয়ে করে আসার পর থেকেই শুনেছিল মল্লিকা এবং শশিভূষণের প্রেমের সম্পর্কের কথা। তার মন ভরে উঠেছিল গভীর বিষাদে। আর তার স্বামীর আশ্চর্য নীরবতা তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বাসন্তীর মনের ওপর ক্ষোভ জমতে জমতে যখন তা ফেটে পড়ে, তখন তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে মল্লিকা।

চা করার জন্য বাসন্তী পুরনো স্টোভটি জ্বালিয়েছে। স্টোভটি অনেকদিন যাবৎ ব্যবহৃত হয়নি। সেই স্টোভটি ব্যবহার করতে দেখে শশিভূষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে তখন বাসন্তীর মন্তব্য -"একটু পুরনো হলেই বুঝি স্টোভ অচল হয়ে যায়।"

স্টোভটি খারাপ, তার মধ্যে হিংস্র গর্জন করে, সে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে। এই গল্পের অভিনবত্ব ছিল প্রকরণগত বিশিষ্টতায়। একটি স্টোভকে অবলম্বন করে লেখক এই গল্পে ব্যপ্তি ও মাত্রাবৃদ্ধির দুরূহ কাজ সমপন্ন করেছিলেন, সুচিন্তিত ও সচেতন আঙ্গিকতায়। 'স্টোভ' নামটি দেখলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে, স্টোভের দাহিকাশক্তি ও তজ্জনিত অগ্নিকাণ্ডের কথা। স্টোভটির এক ঘেঁয়ে কর্কশশব্দ শশিভূষণ ও বাসন্তীর নিস্তেজ দাম্পত্যের প্রতীক ছিল। অন্যদিকে মল্লিকার ব্যর্থ প্রেমের প্রতীক ছিল। মল্লিকার কাছে শশিভূষণ ছিলেন, 'আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষ'। স্টোভ আর শশিভূষণের মানসিক সত্তার সমীকরণ ঘটিয়ে লেখক ঘোষণা করে দিয়েছিলেন— বাসন্তী প্রাণপণে স্টোভটায় পাম্প দিয়েছে, কিন্তু এরকম কোনো দুর্ঘটনাই ঘটেনি। স্টোভটি যেমন ছিল শশিভূষণের মনের মধ্যে ঘটে যাওয়া মানসিক টানাপোড়েনের প্রতীক তেমনি মল্লিকা আর বাসন্তীরও। আশ্চর্যভাবে তারা দুজনেই কেউ স্টোভকে ভয় করে না যেমন তারা ভয় করে না শশিভূষণের নিস্তেজ অস্তিত্বকেও।

স্টোভের ফেটে যাওয়া শশিভূষণ ও মল্লিকার অতীত প্রেমের নতুন করে উজ্জীবনের ইঙ্গিত। কিন্তু বাসন্তী নিশ্চিত ছিল, যে স্টোভটি কোনোদিন ফাটবে না। কারণ কোনোদিন কোনো রং যদি শশিভূষণের মনে লেগেও থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জেনেছিল, যে রং তার অনেক আগেই ধুয়ে মুছে গেছে।

শশিভূষণের নিস্তেজ হয়ে যাওয়া পৌরুষের প্রতি ধিক্কারে আর তার প্রতি আত্মগ্লানিতে মল্লিকার মনোভাব ছিল "শশিভূষণের নিজের মধ্যে কোনো প্রেরণা নেই চকিতে তার মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। এই আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্য গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্তে সে নিঃশব্দে পুড়ে খাক হয়েছে, কিন্তু সত্যি একে জয় করে নিলে সে কি সুখী হত? ভিজে সলতোয় সারাজীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্যহ হয়ে উঠত নাকি?"

লেখক এই গল্পে নিরপেক্ষতা দেখিয়েছিলেন কিন্তু নির্লিপ্ত ছিলেন না। প্রতিটি চরিত্রের পাশেপাশে তার যেন একটা অদৃশ্য উপস্থিতি ছিল, তার গভীর পর্যবেক্ষণ চরিত্রগুলিকে আপাত মস্তক ভাবে মেলে ধরেছে পাঠকের সামনে। "শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস করে চিনতে চায় না।" মল্লিকা ইচ্ছা করলে সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি শশিভূষণের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি, নারীসুলভ সংকোচে আর লজ্জা আর একটু আহত অভিমানে। প্রতিটি চরিত্রের মনের মধ্যে চলা দোলাচলতাকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। শশিভূষণের অন্তঃসারশূন্য পৌরুষত্ব, মল্লিকার ভলোবাসায় ব্যর্থতা, বাসন্তীর অসন্তুষ্ট দাম্পত্যের প্রতি অবিশ্বাস সমস্তই তার স্টোভ ঘিরে গর্জে উঠেছিল।

স্টোভটি যেন এই সংসারের প্রতীক ছিল। শশিভূষণের অসহায়তা ও আত্মবিশ্বাসহীনতাকে লেখক ভিজে সলতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনটি চরিত্রকেই তিনি ব্যঞ্জিত করেছিলেন স্টোভের মধ্যে দিয়ে। তিন জনেরই জীবনের যন্ত্রনা নিয়ন্ত্রকারী ও নিয়তির মতো শক্তিশালী ছিল স্টোভ। মানুষের অবচেতন মনের গভীর যে আদিম প্রবৃত্তি কাজ করে থাকে, তার চেতন স্তরের মধ্যে ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে যেন 'স্টোভ' টির আচরণে।

উপসংহার:

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের প্রধান বিষয় ছিল নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম, দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকা। যে শিক্ষিত সমাজ পতিতাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দিতে চায় না। কিন্তু এই সমাজের জন্যই সরল সাধারন মেয়েকে পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। আমার এই গবেষণা ধর্মী লেখাতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প 'শুধু কেরানী'তে নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরানী দম্পতির আর্থিক টানাপোড়েনের দিকটি লেখক দেখিয়েছেন। 'মহানগর' গল্পে একজন সাধারণ মেয়ে চপলা, তাকে বাধ্য করা হয়েছিল পতিতা হতে। এই সমাজ একজন মেয়েকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়, পরে যখন সেই মেয়ে পঙ্কিল ক্লেদাক্ত জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন আর সমাজে নিজের পরিবারেও স্থান হয় না। সেই অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের ছবি এঁকেছেন এই গল্পে লেখক। 'সংসার সীমান্তে' গল্পটিতে একজন পতিতা নারী আর একজন দাগী চোর। অঘোর দাস এই দুই জন তাদের গ্লানিময়, অন্ধকার জীবন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে ভদ্র সমাজের মানুষের মতো বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছে। 'স্টোভ' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন তিনটি চরিত্রের মধ্যে মানসিক টানাপোড়ন। মনের মধ্যে বেড়ে চলা ক্ষোভ ফেটে পড়েছে 'স্টোভ' এর আকৃতি ধারণ করে।

তথ্যসূত্র:

১) পাল, শ্রাবণী, সম্পাদিত, বাংলা ছোট গল্প পর্যালোচনা।

২) মুখোপাধ্যায়, তরুণ, বাংলা ছোটগল্পের দিগ্বলয়, ভাষা ও সাহিত্য ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯।

৪) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বাংলা গল্প বিচিত্রা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলকাতা - ১২।

৫) ভট্টাচার্য, সৌরীন, সম্পাদনা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা - ৭০০ ০৭৩।